International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-II, March 2022, Page No. 56-62
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i2.2022.56-62

রবীন্দ্রনাথের কালিদাস

ড.অনিরুদ্ধ বিশ্বাস
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, বাগাটি, মগরা, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract:
Kalidasa and Rabindranath are two of the best writers of all time. The period of Kailas is approximately 365AD to 415AD and Rabindranath's from 1861AD to 1941AD. Kalidasa wrote epic, fragmentary, plays etc. Rabindranath was very interested in the writings of Kalidasa and his era. That is why in his poem 'Meghdoot' from his book 'Manasi',he has perfectly portrayed the era of Kalidasa. The river-hill-town of that ancient time has attracted him strongly. His attraction is endless. So that he is also a follower of Kalidasa in the poem 'Swapna' of the book 'Kalpana'. The influence of these two poems is evident here,on the one hand 'Ritusanhara' and on the other hand 'Meghdoot'. The message of Kalidasa's 'Ritusanghara' is well expressed in blank verse 'Ritusanhara' of Rabindranath's 'Chaitali'. He wrote 'Kumarasambhav Gaan' following 'Kumarasambhav'. The clear influence of 'Kumarsambhav' can also be seen in the verse play 'Chitrangada'. Rabindranath wrote about Kalidasa's 'Abhijnan Shakuntalam' in his various writings. That is what is in the essay 'Shakuntala' it is also in the 'Kabyer Upekshita'. In fact,our point is that throughout Rabindranath's life the influence of Kalidasa is seen. The influence of Kalidasa and his creation is directly present in his numerous writings. Both the poets of the two periods were nature lovers. Rabindranath has also been fascinated by the nature of Kalidasa's literature somewhere.

Keyword: Kalidasa, Rabindranath, strong influence, Abhijnan Shakuntalam, Meghdoot, Nature lover.

প্রাচীন ভারতকে জানতে গেলে কালিদাসকে জানতে হবে। আর আধুনিক ভারতকে জানতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন।অমরু, বানভট্ট– সকলের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রবল। তবে এ কথা সহজেই বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিলেন কালিদাস এবং কালিদাসের যুগ। যদিও কালিদাসের যুগ সম্পর্কে এখনও স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। তবে কোনো কোনো পণ্ডিত গবেষক মনে করেন কালিদাস পুষ্যমিত্র শুঙ্গের (১৮৫ খ্রীঃ পূঃ-১৪৯ খ্রীঃ পূঃ) রাজত্বকালে আবির্ভূত হন।আবার অন্য একদল পণ্ডিত গবেষক মনে করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫ খ্রীঃ- ৪১৫ খ্রীঃ) রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন কালিদাস। এই দুই তথ্য থেকে বলা যায় খ্রীষ্টপূর্ব

দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সীমার মধ্যেই কালিদাসের আবির্ভাব কাল দোলায়িত হয়েছে। যদিও আজ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নি। তবে দ্বিতীয় মতামতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কারণ ঐতিহাসিক বিভিন্ন সাক্ষ্য এবং কালিদাসের রচনাবলীর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে মোটামুটি এ কথা প্রমাণ করা যায়।

এ বার কালিদাসের রচনাবলী বিহঙ্গ চক্ষু দৃষ্টিতে একবার দেখে নেওয়া যাক। 'কুমারসম্ভবম্' ও 'রঘুবংশম্ '– দুটি মহাকাব্য। 'ঋতুসংহারম্' ও 'মেঘদূতম্' –খণ্ডকাব্য। এ ছাড়া তিনটি নাটক যথাক্রমে 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্',' বিক্রমোর্বশীয়ম্' এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। এ ছাড়াও লোকপ্রবাদ আছে যে, 'নলোদয়','শ্রুতবোধ','শৃঙ্গারতিলক', শৃঙ্গারাষ্টক,'পুষ্পবাণবিলাস', 'দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা কালিদাস। তবে এই সকল রচনা কালিদাসের কি না তা নিয়ে প্রবল সন্দেহ আছে পণ্ডিত মহলে।

ফিরে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের কথায়। নবীন বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে লিখলেন 'মেঘদূত' কবিতা। 'মানসী' কাব্যগ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম কবি হয়ে উঠতে শুরু করলেন। সেই সময়েই তিনি কালিদাসের সৃষ্টি নিয়ে নির্মাণ করলেন এই 'মেঘদূত'। এই এক কবিতার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কালিদাসের যুগের অধিবাসী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। যক্ষের মতো তিনিও যেন কামনার মোক্ষধাম প্রাচীন উজ্জয়িনী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনিও যক্ষের মতো ব্যাকুল হৃদয়ে বারে বারে কালিদাসের কালে ফিরে গেছেন। সে কালের নদী-গিরি-জনপদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে তীব্রভাবে। সে কথা প্রকাশ করেছেন তিনি পদ্যে। মানসনেত্রে তিনি দেখতে পাচ্ছেন আম্রকূট পর্বত,রেবা,বেত্রবতী নদী, বেত্রবতীর কূলে দশার্ণ গ্রাম, সেখানকার জনপদবধূ— সকলেই তাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত রবি কবির কাব্যে।উজ্জয়িনীর 'নিশিদ্বিপ্রহরে' বিরহবিকারে রমণী চলেছে অভিসারে। তিনি আরো দেখতে পাচ্ছেন—

"কোথা সে বিরাজে
ব্রহ্মাবর্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।"[১]

মন তাঁর মেঘের সাথে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় পৌঁছে যায় কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে। যেখানে আছেন সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি বিরহিণী প্রিয়তমা। কবি এখানে আসতে পেরে নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কালিদাসের প্রতি—

"সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে ,তুমি ছাড়া,করি অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী— অমর ভুবনে! "[২]

তিনি এও জানিয়েছেন যে কবির মন্ত্রে রুদ্ধ হৃদয় আজ মুক্ত হয়েছে। বিরহের স্বর্গলোক আজ লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই আবার উনিশ শতকে এসে পড়েন কবি। পুনরায় শুরু হয় তাঁর বিরহ। সেই বিরহাতুর হৃদয়ে তাঁর প্রশ্ন তাই–

"কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?

কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?"[৩]

এই গভীর বিরহ 'মেঘদূত'-এই শেষ হয়ে যায় নি, 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতায় সে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।কবি উজ্জয়িনীপুরে তাঁর পূর্বজন্মের প্রথম প্রিয়াকে খুঁজতে গেছেন।সেখানে দেখা হয় সেই প্রিয়ার সাথে–

"মুখে তার লোধ্ররেণু , লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।" [৪]

এ সকল রবীন্দ্রনাথের চেনা। কালিদাস যে তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছেন। চেনা মহাকাল মন্দির, চেনা প্রিয়ার ভবন, দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, সিংহদুয়ার– কিছুই অগোচর থাকে না কবির। নারীর রূপচর্চার কথাও এসে পড়ে এখানে। 'ঋতুসংহার' কাব্যে কালিদাস মিলনেচ্ছু নারীর রূপচর্চার যে বর্ণনা 'বসন্তঋতু' অংশে দিয়েছেন তারই অনুরণন লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথে।তিনি বলেন—

"অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।"[৫]

'ঋতুসংহার' কাব্যেও গ্রীষ্মের বর্ণনায় চন্দনের পত্র লেখার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেয়সী যখন সামনে আসে তখন তাকে প্রতিমা মনে হয়। এই প্রিয়া এগিয়ে এসে কবির হাতে হাত রেখে গভীর মমতায় কবির কাছে জানতে চান, 'হে বন্ধু আছ তো ভালো?' তারপর দুজনেই বাক্ হীন। ভাষাহীন। শুধু 'অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে'।

কালিদাসের যুগে বারে বারে রবীন্দ্রনাথ মানসভ্রমণ করেছেন। কালিদাস যেখানে মেঘকে দূত হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গিয়ে হাজির হয়েছেন। দুজনেই সৌন্দর্যের পূজারী। দুজনেই বিরহের মধ্যে প্রেমের পূর্ণতা দেখেছেন। কালিদাসের যক্ষ বিরহী। আর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই বিরহী। তাই স্বপ্নে মিলন ঘটলেও বাস্তবতা ধরা পড়েছে স্বপ্নভঙ্গে। এই স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে দিয়ে দুই কালের ব্যবধানকেও স্পষ্ট করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই কবিতার শেষে তিনি বলেছেন–

" রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।"[৬]

'স্বপ্ন' কবিতায় একদিকে 'মেঘদূত' অন্যদিকে 'ঋতুসংহার'- এর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব গভীর। মহাকবির পূর্বস্মৃতি বাহিত রবীন্দ্রনাথে।

কালিদাসের কাব্য একমাত্র যথাযথ স্পর্শ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার কারণ হলো কালিদাসের সত্তাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি। তাই কালিদাসের সৃষ্টিকে অবলম্বন করে যেখানেই রবীন্দ্রনাথ নতুন সৃষ্টি করেছেন তা সবসময়ই হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। তা সে 'ঋতুসংহার'ই হোক কিংবা 'কুমারসম্ভব' বা 'মেঘদূত'ই হোক।

কালিদাসের 'ঋতুসংহার' নামক সংক্ষিপ্ত খণ্ডকাব্যে ছটি প্রধান ঋতুর বর্ণনা করেছেন। গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে কাব্যটি শুরু হয়েছে।তবে কাব্যটি শুধু ষড়ঋতুর বর্ণনা মাত্র নয়। একটি ঋতুর আবির্ভাবের সঙ্গে বহির্জগতে এবং মানুষের মনোরাজ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে,পতি-পত্নী,প্রেমিক-প্রেমিকার মানসলোকে প্রতিটি ঋতু তার আগমনীর সুরে যে অপূর্ব ভাববৈচিতের্য্র সৃষ্টি করে, তাই-ই কবির উপজীব্য। এখানেই 'ঋতুসংহার' অনন্য। তবে কোনো কোনো সমালোচকের মতে প্রথম সর্গে বর্ণিত নিদাঘবর্ণনাই এ কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। কালিদাস এখানে ছটি বিভিন্ন ঋতুকে কামাকুলচিত্ত তরুণের এক অভিন্ন নবীন দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসলে প্রকৃতি বর্ণনার সমান্তরালে কালিদাস এখানে কামিজনের চিত্তবৃত্তিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঋতুসংহার' নামক চতুর্দশপদী কবিতাটিতে 'ঋতুসংহার'-এর এই মূলবার্তাটি অনন্যসাধারণ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন—

"হে কবীন্দ্র কালিদাস,কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যসিংহাসন- 'পরে।
মরকতপাদপীঠ-বহনের তরে
রয়েছে সমস্ত ধরা, সমস্ত গগন
স্বর্ণরাজছত্র ঊর্ধ্বে করেছে ধারণ
শুধু তোমাদের 'পরে,ছয় সেবাসাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি;
নব নব পাত্র ভরি ঢালি দেয় তারা
নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা
তোমাদের তৃষিত যৌবনে;ত্রিভুবন
একখানি অন্তঃপুর, বাসভবন।
নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী—
তুমি শুধু আছ রাজা,আছে তব রানী ।"[৭]

'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যটি মূলত কুমার কার্তিকেয়র জন্ম থেকে শুরু করে তারকাসুর বধ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারকাসুর বধের জন্যই শিব ও পার্বতীর পুত্র রূপে কার্তিকেয়র জন্ম বৃত্তান্ত এ কাব্যের উপজীব্য। তারকাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবগণ দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানান একজন যোগ্য দেবসেনাপতি সৃষ্টি করতে যিনি দৈত্যদের হাত থেকে দেবতাদের রক্ষা করতে পারেন। মহাদেব তা অস্বীকার করতে পারেন ন। ফলে গিরিরাজের কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, হিমালয়ে পার্বতীর কঠোর তপস্যা এবং শেষ পর্যন্ত পার্বতীর সঙ্গে মহাদেবের মিলন এবং দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র জন্ম— এই

হল কাব্যের বিষয়। এই বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'কুমারসম্ভবগান'। সেখানে কবি চমৎকার এক কল্পলোক সৃজন করলেন। সমালোচক শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

> "হিমালয়ের পার্বত্য বনপ্রদেশে আলো-অন্ধকারের ভিতরে চেতন-অচেতনের মেলামেশার ভিতর দিয়া কবি যে এক কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে কোন স্পষ্ট বুদ্ধির দীপ-বর্তিকা লইয়া কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, সেখানে প্রবেশ করিতে হয় রসানুভূতির আলো-আঁধারি গোধূলিতে।" [৮]

আমরা দৃষ্টি দিতে পারি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রতি। 'কুমারসম্ভবগান' কবি যখন দেবদম্পতিকে শুনিয়ে আসতেন তখন প্রমথগণ চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতো। তখনকার প্রকৃতিজগত রবীন্দ্রনাথের কলমে ধরা পড়েছে এভাবে—

"শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর
স্থগিত-বিদ্যুৎ-লীলা, গর্জনবিরত-,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা।কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে— যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে, কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।"[৯]

এমন বর্ণনা বর্ণনাতীত। সে কারণেই সমালোচক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য যথার্থ মন্তব্যই করেছেন—

> "অসমাপ্ত 'কুমারসম্ভবে'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি 'যখন শুনালে কবি দেবদম্পতিরে কুমারসম্ভব গান'— এই চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।"[১০]

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্য-কাব্যেও 'কুমারসম্ভব'-এর স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।'চিত্রাঙ্গদা'-তে দেখা যায় অর্জুনের হৃদয় হরণ করতে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদনের সাহায্য চেয়েছে এবং তাদের সাহায্যে নিজ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সফলও হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ভাবে এখানে পার্বতীর শিবের মন জয়ের কথাকে স্মরণে রেখেছিলেন। তাই কিছুকাল পরেই দেখা যায় চিত্রাঙ্গদা দেহজ রূপকে ধিক্কার জানাচ্ছে। কারণ দেহজ রূপের জন্য নারী পুরুষের আকর্ষণ আসলে প্রেমের তীব্র অপমান। তাই রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বলেছে–

"এই দু'টি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দু'টি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা? কোথায় রহিল পড়ে

নারীর সম্মান? হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ,
ক্ষণস্থায়ী।" [১১]

'মেঘদূত' তো রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি জুড়েই ছড়ানো রয়েছে নানা ভাবে।নববর্ষার মেঘের কথাকে প্রকাশ করবার ব্যাকুল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্গত 'নববর্ষা' প্রবন্ধে 'মেঘদূত' সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ভারী চমৎকার। তিনি বলেছেন—

> "মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবাৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।"[১২]

আবার 'প্রাচীন সাহিত্য'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' প্রবন্ধে তিনি কালিদাসের কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন বলে আক্ষেপ করেছেন। এখন আর সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। কালের নিষ্ঠুর ব্যবধানই সবচেয়ে বড় বাধা এক্ষেত্রে। তাই কালিদাসের কালে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করা সম্ভব এখন।তাই তিনি লিখেছেন—

> "দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে প্রবাসীরা আপন আপন পথিকবধূর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্ত্যলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।"[১৩]

এখানেই তিনি বলেছেন যে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে যক্ষের মত অতলস্পর্শ বিরহ।'মেঘদূত'কে স্মরণে রেখে এখানে এক অভিনব উপলব্ধির কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন লেখায় লিখেছেন।'শকুন্তলা' প্রবন্ধে আছে শকুন্তলার কথা। প্রবন্ধটি মূলত শুরু হয় ইউরোপের কবিকুলগুরু গেটের শকুন্তলা বিষয়ক মন্তব্যকে আশ্রয় করে।রবীন্দ্রনাথ সরল ভাবে বুঝিয়ে দেন গেটের মন্তব্যের তাৎপর্য। তারপর নিজস্ব বক্তব্যকে তুলে ধরেন।এখানে আমরা শকুন্তলাকে অন্য রূপে খুঁজে পাই।শকুন্তলা সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "সে আপনাকে দমন করিবার, গোপন করিবার উপায় করিয়া রাখে নাই। যে হরিণী ব্যাধকে চেনে না তাহার কি বিদ্ধ হইতে বিলম্ব লাগে? শকুন্তলা পঞ্চশরকে ঠিকমত চিনিত না, এইজন্যই তাহার মর্মস্থান অরক্ষিত ছিল। সে না কন্দর্পকে, না দুষ্মন্তকে, কাহাকেও অবিশ্বাস করে নাই। যেমন, যে অরণ্যে সর্বদাই শিকার হইয়া থাকে, সেখানে ব্যাধকে অধিক করিয়া আত্মগোপন করিতে হয়, তেমনি যে সমাজে স্ত্রীপুরুষের সর্বদাই সহজেই মিলন হইয়া থাকে সেখানে মীনকেতুকে অত্যন্ত

সাবধানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাজ করিতে হয়। তপোবনের হরিণী যেমন অশঙ্কিত তপোবনের বালিকাও তেমনি অসতর্ক।"[১৪]

শুধু শকুন্তলার কথাই তিনি লিখলেন না,লিখলেন প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার অন্তর্বেদনার কথাও। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে এই দুই সখীর কথা তাদের অন্তরের ভিতরে ঢুকে রবীন্দ্রনাথ টেনে বের করে আনলেন। দেখালেন যে শকুন্তলার অধিকাংশই এই দুই সখী।শকুন্তলাই সেখানে সর্বাপেক্ষা কম।আসলে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের চরিত্রের সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন বলেই এ কথা লেখা সম্ভব হয়েছে।

এই স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই।তাই আমাদেরও কিছু ইঙ্গিত দিয়েই আলোচনার ইতি টানতে হয়।তবুও এরই মধ্যে বলতে হয় যে,রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতায় কালিদাস ও তাঁর সৃষ্টির প্রভাব সরাসরি বিদ্যমান। অনেক কবিতায় তিনি কালিদাসের প্রসঙ্গ এনেছেন।আসলে দুই কালের দুজন কবিই ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক।তাই দুই কবির কাব্যেই ষড়ঋতু অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কবি সত্তায় কালিদাসের প্রভাব গভীর ও চিরস্থায়ী। সব শেষে একটি কথা বলা যায়, হল, রবীন্দ্রনাথই কালিদাসকে আবার নতুন করে চেনালেন আমাদের। তাঁর সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কলমে পেল আর এক নতুন রূপ।তাই এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস কালিদাসকেও ছাপিয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র:

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৪১৫, পৃ.৩৩৮।
২। তদেব, পৃ.৩৩৮।
৩। তদেব,পৃ.৩৩৯।
৪। ররবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃ.১০৯।
৫। তদেব,পৃ. ১১০।
৬। তদেব, পৃ. ১১১।
৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ.২০।
৮। দাশগুপ্ত, শ্রী শশীভূষণ, ত্রয়ী, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৫৩, পৃ.১৮৪।
৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১৫, পৃ.৪৩।
১০। ভট্টাচার্য শ্রীবিষ্ণুপদ, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ,চৈত্র ১৩৬৭,পৃ.৫।
১১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৪১৫, পৃ. ২২২
১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫, পৃ.৬৯০।
১৩। তদেব, পৃ.৭১৭।
১৪। তদেব, পৃ. ৭২৪।